নাজিম উদ্দিন মোস্তান * মোঃ আবদুল কাদের

এ ব্যর্থতা সরকারের

এশীয় কমপিউটার শার্দুলদের আসরে মূষিক বাংলাদেশ

সমগ্র এশিয়া জুড়ে কমপিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির অভাবিত অগ্রগতির এযুগে শিল্পপ্রযুক্তিতে অগ্রসর ভারতের অবস্থা প্রযুক্তিসমৃদ্ধ এশীয় বাঘের আসরে ভয়কাতুরে বিড়ালের মত। এশীয় শার্দুল সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, হংকং দক্ষিণ কোরিয়ার পর থাইল্যাণ্ড ও মালয়েশিয়া যখন কমপিউটার রাজ্যে অগ্রসর হচ্ছে ব্যাঘ্রবিক্রমে, তখন সমগ্র বিশ্বে উৎপাদিত কমপিউটার, ডিস্ক ড্রাইভ, ডট মেট্রিক্সের মত হার্ডওয়্যারের ১০ হতে ৪৭ ভাগ উৎপাদিত হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ায়। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি পাশ্চাত্য মুলুক ছেড়ে ছুটে আসছে কমপিউটারের মহাদেশ এশিয়ায়। এর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়? দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সাথে ব্যবসা-আমদানী-চোরাচালান-সফর-চিকিৎসার সূত্রে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিবিড়। কিন্তু কমপিউটার শিল্প, প্রযুক্তিচর্চা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবধান যেন শতাব্দীর।

এশীয় ব্যাঘ্ররা কমপিউটরায়িত একবিংশ শতাব্দীর শার্দুল হিসাবে বিশ্ববাজারকে আয়ত্ব করার অভিযানে যখন অনেকদূর এগিয়ে গেছে স্ব স্ব সরকারের নেতৃত্বে, তখন ১১ কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশে কমপিউটার ব্যবহারের যোগ্যতার অধিকারী সোয়া ১ কোটি মানুষ থাকলেও সরকারের লক্ষ্যহীনতা, নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা, এবং পথিকৃৎ হবার যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষদের উদাসীনতায় বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে মুষিকে। অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে এ অবমাননাকর অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকার অর্থ করুণ। এর পরিনামে আরও এক শতাব্দী এদেশের মানুষকে চরম দারিদ্রে বন্দী থাকতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত সাহসী ও দৃঢ় বিরাট পদক্ষেপ ছাড়া দারিদ্র্যপীড়িত এদেশটির মুক্তি নেই। কিন্তু সরকার ও প্রতিষ্ঠানগুলি এশিয়ার বিস্ময়কর অগ্রগতির এ পর্যায়েও বসে আছে, অযোগ্যতা ও নিস্ক্রীয়তার গদীতে।

বাংলাদেশের অবস্থান আজ কোথায়? এপ্রশ্ন সবার। সমগ্র এশিয়ায় তথ্য প্রযুক্তি ও কমপিউটার ব্যবহার বৎসরে বৃদ্ধি পাচ্ছে শতকরা ১০ হতে ৩০ ভাগ হারে। বাংলাদেশে ৭ বৎসরে এসেছে মাত্র ৭ হাজার কমপিউটার। তার বহুলাংশই অব্যবহৃত। কমপিউটার ও তার অংশগুলি তৈরীতে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ বিশ্বজয়ী দক্ষতা অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোনই মাথাব্যাথা নেই। ডাটা এন্ট্রিতে পা দিয়ে বাংলাদেশ গার্মেন্টিসের মত শিল্প প্রতিষ্ঠা করে ৪ লক্ষ বেকারকে কমপিউটারের সামনে বসিয়ে দিলে প্রতিদিন তথ্য প্রযুক্তি ও কমপিউটার শিল্পের জগত এগিয়ে আসতো এদেশের দিকে। কিন্তু তা করতে সরকার ও উদ্যোক্তারা একযোগে এগিয়ে আসছেন না। এদেশের সরকারের মন্ত্রী, সচিব, কর্মকর্তারা অহরহ ঘুরে বেড়ান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। নিজের সন্তানদের জন্য কমপিউটার, কমপিউটারের শিক্ষা প্রণালী, সহায়িকা আনেন তাঁরা সিঙ্গাপুর হতে তুরস্ক পর্যন্ত নানা দেশ ঘুরে। কিন্তু এদেশের বেকার শিক্ষিত প্রজন্মের জন্য ডাটা এন্ট্রিসহ নানা কমপিউটারভিত্তিক শিল্পের দারোদঘাটনের জন্য এতটুকু চেষ্টা করেননা। এ উদাসীনতা ও উপেক্ষাই বাংলাদেশকে এশীয় উন্নয়ন যুগের হতচ্ছাড়া মুষিকে পরিণত করেছে। এর জন্য দায়ী সরকার। দায়ী প্রশাসন। দায়ী শাসক। দায়ী পার্লামেন্ট। দায়ী দায়িত্ব ন্যস্ত কর্মকর্তারা।

সন্দ্বীপের মত দ্বীপদেশ তাইওয়ান নানা দেশ থেকে প্রযুক্তি দেখে, শিখে, অনুকরণ করে ব্যাঘ্রবিক্রমে ঢুকে পড়েছে বিশ্ব কমপিউটার উৎপাদন, রপ্তানী ও বিপননের বাজারে। বিশ্ববাজার জয় করার পর জাপানে ঘর গেরস্তালী, শিল্প, বাণিজ্যে কমপিউটারের ব্যবহারে জীবন যাচ্ছে সম্পূর্ণ বদলে। দক্ষিণ কোরিয়ার শিক্ষার্থীরা কমপিউটার ছাড়া আজ অধ্যয়ন করে না। পাশ্চাত্যকে অতিক্রম করে এশিয়া তার বিশাল চাহিদা ও উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে কমপিউটার যুগ একবিংশ শতাব্দীতে পা বাড়াচ্ছে। কিন্তু আমরা কোথায়? কোথায় ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তরাঙা বাংলাদেশ।

৯০ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৮৪ কোটি। জাতীয় আয় ২৮০০০ কোটি ডলার। ৯০ সাল পর্যন্ত স্থাপিত পিসির সংখ্যা ৩ লাখ। হার্ডওয়্যারের বাজার বছরে ৭০ কোটি ডলার।

চীনের জনসংখ্যা ১১১ কোটি। তার জাতীয় উৎপাদন ৪১৩০০ কোটি ডলার। স্থাপিত পিসির সংখ্যা ৫ লক্ষ। হার্ডওয়্যার বাজার ৫০ কোটি ডলার। দক্ষিন কোরিয়ার জনসংখ্যা কোটি ৩০ লক্ষ। জিডিপি ২৩৭০০ কোটি ডলার। স্থাপিত পিসির সংখ্যা ১২ লক্ষ। হার্ডওয়্যার বাজারের আয়তন ১২০ কোটি ডলার।

হংকং জনসংখ্যা ৫৮ লক্ষ। জাতীয় উৎপাদন ৭০০০ কোটি ডলার। স্থাপিত পিসি ২ লক্ষ। হার্ডওয়্যার মার্কেট ৪০ কোটি ডলার।

সিঙ্গাপুর জনসংখ্যা ২৭ লাখ। জাতীয় উৎপাদন ৩৫০০ কোটি ডলার। স্থাপিত পিসির সংখ্যা ১ লাখ ৫০ হাজার। হার্ডওয়্যার বাজার ৪০ কোটি ডলার।

তাইওয়ান জনসংখ্যা ২ কোটি। জাতীয় উৎপাদন ১৬০০০ কোটি ডলার। স্থাপিত পিসি ১০ লক্ষ। হার্ডওয়্যার বাজার ৬৪ কোটি ডলার।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১১ কোটি। জাতীয় উৎপাদন ৭০ হাজার কোটি টাকা ২০০০ কোটি ডলার। ৯০ সাল পর্যন্ত স্থাপিত পিসির সংখ্যা ৭ হাজার। হার্ডওয়্যারের বাজার বৎসরে ৮০ লক্ষ ডলারের।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশকে পদানত করার আগে মসলিনের বস্ত্রবয়ন, জাহাজনির্মাণ, লালচিনির শিল্পসহ অজস্র পণ্যোৎপাদনে এই বাংলাদেশে কৃষির চাইতে শিল্প-বাণিজ্যের উৎপাদন হয়ে উঠেছিল প্রভূত। ইতালীতে রপ্তানী হতো বাংলাদেশের সমরাস্ত্র কামান, মধ্যপ্রাচ্যে যেতো সওদাগরী জাহাজ, ইউরোপকে জয় করেছিল মসলিন। আজ গার্মেন্টস শিল্পের সংস্পর্শে আবার জেগে উঠেছে সেই পরাভূত পর্যুদস্ত শিল্পস্পৃহা।

উৎকর্ষ মেধার এদেশ সহজ, সরল ও অজটিল কমপিউটার শিল্পে বিশ্বে বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারতো। কিন্তু নেতৃত্ব, দিশারী ভূমিকা এবং দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের জন্য কিছু করার সমুন্নত মানসিকতার অভাবে বাংলাদেশকে এশিয়ার কীটপতঙ্গে পরিণত করেছে আমাদের সরকার, প্রশাসন, সংস্থা, নেতা-নেত্রী ও কর্তারা।

এশিয়ার আসন্ন জাগরণ যুগের ইঙ্গিত দিয়ে গর্জে উঠছে দক্ষিণ এশিয়ার শার্দুলরা। ভারতের কথিত বিশালত্ব, মেধা ও প্রযুক্তিকে তুচ্ছ বিল্লীতে পরিণত করে এশিয়ার বুকে মেদিনী কাঁপিয়ে জাগছে প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ছোট দেশগুলির গর্জন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ আসলেই দূরপ্রাচ্যকে বাঘের মত ভয় পায়। জাপানের পর কোরিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান প্রযুক্তি ও বাণিজ্যের ব্যাঘ্র থাবা মেলে পাশ্চাত্যের মুখের উপর আঁকছে এশিয়ার আসন্ন উত্থানের ছাপ। এর পিছনে আসছে মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, এমনকি ভিয়েতনাম। **যুগের প্রযুক্তি, পদ্ধতি ও সাধনা যথাসময়ে সহজ সরলভাবে আয়ত্ব করতে না পেরে বাংলাদেশ যখন পড়ে আছে বে-শরম পরজীবিদের বুদ্ধিবৃত্তিক পারস্পরিক পিন্ডি চটকানের আজব লীলায়, তখন শ্রমবৃত্তি, প্রযুক্তি চর্চা, শিক্ষা, বিজ্ঞানের পথ বেয়ে স্থবিরতার পাহাড় ধসিয়ে বিদেশী বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির প্রবাহ এনে এশীয় শার্দুলরা হয়ে উঠছে সাফল্যের রূপকথার দেশ।**

জাপানকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে নূতন ব্যাঘ্ররা। শিল্পে পণ্যরপ্তানীর বিস্ময়কর উদ্বৃত্ত নিয়ে জাপান যতই লগ্নিপুঁজির কারবারের দিকে সরছে, ততই সে শূণ্যতাকে আরও ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতায় পুরণ করতে গিয়ে দলবদ্ধভাবে অগ্রসর হচ্ছে এশীয় বাঘেরা। ১৯৯০ সনে এরা এশিয়া প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের হার্ডওয়্যার রপ্তানীকে ৩৩০০ কোটি ডলারে পৌঁছে দিয়েছে। যেখানে ভারতের হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার আইটি (তথ্যপ্রযুক্তি)র মোট উৎপাদন ১০০ কোটি ডলারও দাঁড়ায় না। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমপিউটারবিদদের দেশ বাংলাদেশের মোট উৎপাদন এখাতে ১ কোটি ডলার ছুতে পারেনি।

সব কয়টি দেশে এ বিরাট সম্ভাবনার খাতে সরাসরি মেধার নেতৃত্ব দিচ্ছে সরকার। বাংলাদেশে সরকারের মন্ত্রী,

সান্ত্রী, কর্তাদের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে গেলে, তাদের অনাগ্রহ, অনীহা, বিরক্তিভরা মুখাবয়ব দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না, দেশের ভবিষৎত নয়, নির্ঝঞ্ঝাট গদীভোগ করার জন্যই এদের আবির্ভাব। এ অবস্থা তথ্য প্রযুক্তিতে আমাদেরকে নেপালও শ্রীলঙ্কার চাইতেও পিছিয়ে নিয়েছে। অথচ সারা পৃথিবীতে কমপিউটারের সিংহভাগে যে মাইক্রো-প্রোসেসরগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে তার ডিজাইন তৈরির মুখ্য ভূমিকায় আছে এদেশেরই বিজ্ঞানীরা। সম্ভাবনাময় সকল ফ্যাক্টর থাকা সত্ত্বেও এ সমস্ত গদীপ্রিয়দের জন্য আমদের অবস্থান ভুটান ও মালদ্বীপের পর্যায়ে নেমে এসেছে। এ প্রতারণা শেষ না হলে বাংলাদেশ এশিয়ার উন্নতির যুগ হারিয়ে আফ্রিকার কাতারে চলে যাবে। পুরো তিনশ বৎসর বিদেশী শাসনের অধীনে যেভাবে প্রতারিত উপেক্ষিত হয়েছে এদেশের জনগণ, ঠিক তেমনি এমনকি তারও চাইতে নির্মম প্রতারণায় আজও মেতে আছে সরকার, রাজনীতি, প্রশাসন ও বুদ্ধিবৃত্তি। দার্শনিক কান্টের উদ্ধৃতি দিয়ে হুশিয়ার করে দেয়া যায় - নেতৃত্ব যদি দেশকে সৃষ্টিশীল ভবিষ্যতের দিকে সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে নিতে না পারে, তাহলে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার বিদীর্ণ হবে সমাজ।

এক দশক ধরে এশিয়ায় ঘটছে এ বিপ্লব। জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে হয়ে উঠেছে দুরন্ত। দশ বছরে জাতীয় আয় হয়ে উঠছে দ্বিগুণ। অস্ট্রেলিয়ার সাদা মানুষের দেশে প্রবৃদ্ধি হার যখন ৩ শতাংশ, তখন কোরিয়ার ১০ শতাংশ। পাশ্চাত্যে কমপিউটার বিক্রি বাড়ছে মাত্র ৮ শতাংশ হারে, এশিয়ায় তা ছড়িয়ে পড়ছে এমনকি ৩০ শতাংশ হারে। বিশ্বব্যাপী মন্দায় রপ্তানীতে ভাটা পড়লেও থামেনি এশীয় বাঘেরা। তাইওয়ান ও হংকং-এর রাজনৈতিক ভবিষ্যত কী হবে, তা নিয়ে উৎকণ্ঠা আছে, কিন্তু কর্ম ও অগ্রগতিতে বিরতি নেই। প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করে যাওয়ার এই প্রত্যয় দৃঢ় মানসিকতার কারণে এশীয় ব্যাঘ্ররা কেবল পাশ্চাত্য নয়, এশীয় বাজারও নিয়ে আসছে এশিয়ার হাতে। এখন ঢাকার হাডিসিয়ের তরুণেরাও তাইওয়ান থেকে ছোঁ দিয়ে এমন প্রযুক্তি ও উপকরণ নিয়ে আসতে পারে, যা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীনের কাছ থেকে পেতে হলে গলবস্ত্র হয়ে তাদের পায়ের নীচে মাথা দিতে হতো। প্রযুক্তির দাসত্ব থেকে মুক্তির যুগ যখন শুরু হয়েছে, সজাগ-সচকিত এশিয়ায় তখন আমাদের শাসক, প্রশাসক ও কর্তারা বড় আমোদে মহাজনের খেরোখাতা থেকে ঋণ নিচ্ছেন, ঘি খাচ্ছেন। এদের জীবনে, অস্তিত্বে, মানসিকতায় মুক্তির জন্য কোন বিদ্রোহ নেই। এরা হচ্ছে এদেশের মুক্তিকামী মানুষের আকাঙ্খার বিপরীতে দাঁড়ানো পরদেশী পরাভব ও প্রযুক্তি দাসত্বের প্রতিভূ।

দুদশক আগে, ৭০-এর দশকে আনবিক বিস্ফোরণের মোড়লীপনার সময় ভারতকে বলা হতো এশীয় প্রযুক্তির বাঘ। সময় তাকে ভেজা বেড়ালে পরিণত করেছে। এশিয়ার দক্ষিণপূর্ব দিকে সামরিক অভিলাষমুক্ত দেশগুলি প্রযুক্তি ও বাণিজ্যের পথ ধরে সত্যিকার বাঘ হয়ে উঠেছে। এখন মালয়েশিয়া থাইল্যাণ্ডও ভারতকে ফেলে বহুদূর এগিয়ে গেছে।

এক দশক ধরে এশিয়ায় ঘটছে এ বিপ্লব। জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে হয়ে উঠেছে দুরন্ত। দশ বছরে জাতীয় আয় হয়ে উঠছে দ্বিগুণ। অস্ট্রেলিয়ার সাদা মানুষের দেশে প্রবৃদ্ধি হার যখন ৩ শতাংশে, তখন কোরিয়ার ১০ শতাংশে। পাশ্চাত্যে কমপিউটার বিক্রি বাড়ছে মাত্র ৮ শতাংশে হারে, এশিয়ায় তা ছড়িয়ে পড়ছে এমনকি ৩০ শতাংশে হারে। বিশ্বব্যাপী মন্দায় রপ্তানীতে ভাটা পড়লেও থামেনি এশীয় বাঘেরা।

তথ্যপ্রযুক্তির উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ কসরতে ভারত ব্যয় করেছে কয়েকদশক। কিন্তু এশিয়ার মোট তথ্যপ্রযুক্তির উৎপাদনে ভারতের অংশ নিতান্তই সামান্য। এতে বাংলাদেশের আনন্দের কিছু নেই। বাংলাদেশ এই দক্ষিণ এশীয় আদিম গুহার মূষিক। ভারতে মধ্যবিত্তের কেনাকাটার শক্তি বেড়েছে। মোটরগাড়ীর চালকও কিনেছে রিফ্রেজারেটর। গত দশক জুড়ে ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ার নিয়ে মুনাফার লোফালুফি হয়েছে অনেক। অগ্রগতির হিসাব বেরিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারী-পরিসংখ্যানের সব ফানুস মিলিয়ে গিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে একটা চুপসানো বেড়াল হিসাবে, গলায় তার বিশ্বব্যাঙ্ক আইএমএফের মহাজনের প্রতিনিধির রজ্জু।

বাংলাদেশও অবকাঠামো ও অভিপ্রায়ের বেসাতির মধ্যে সাহায্যদাতাদের ফাঁদে ল্যাজ আটকানো মুষিকের মত অবস্থায় পতিত হয়েছে। ভারতকে যেমন পেয়ে বসেছিল আত্মশ্লাঘায় ফেকী হয়েছিরে বাবা - অনুভূতিতে, তেমনি বাংলাদেশকে পেয়েছিল, সাহায্যপাত্রের উপযুক্ত থাকবার জন্য ফতুর হবার মানসিকতায়। না ভারতে, না বাংলাদেশে কোথাও শিল্প ও নবপ্রযুক্তিতে অগ্রগতি ঘটেনি। কিন্তু এ দুদেশে টেলিভিশনের পর্দায় অগ্রগতির নির্লজ্জ ফিরিস্তি শুনলে কানে তালা লাগে। বাংলাদেশ তিনশ বছর ধরে অধঃপতিত ও নিশ্চল। এখান থেকে তাকে তুলে আনবার জন্য দরকার ছিল বাঘদের অনুসরণ। কিন্তু মুষিক তার বিড়ালের ভয়কে বিল্লীপ্রেমে পরিণত করেছে এবং দুটোই পড়েছে আদিম হিংস্র মানসিকতার অন্ধ আবর্তে।

আজ সংবাদপত্র কমপিউটার ছাড়া ছাপা যায় না। কাঁচামালের আড়তে ক্যালকুলেটর ছাড়া হিসাব চলে না। সার্কুলার নিটিং ও বস্ত্রবয়ন কল চালায় কমপিউটার। এটিপি বিমানের কন্ট্রোল প্যানেল সম্পূর্ণ কমপিউটার নিয়ন্ত্রিত। কমপিউটার আর আধুনিক ব্যবস্থাপনা, পণ্য ও প্রযুক্তি বদল করে ক্রমাগত উৎপাদন, কৃষির বাণিজ্যিকীকরনের মাধ্যমে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ কৃষিকে শিল্পের রূপদান, বিশ্বজোড়া অখণ্ড বাজারে চ্যালেঞ্জ করে, গুহাবাসী না হয়ে, বীরদর্পে বাঘের মত বেরিয়ে বাজার সভ্যতার মূলদেশ আমেরিকায় ঢুকে পড়ার স্পর্ধা হচ্ছে এশীয় বাঘদের কাছ থেকে শেখার জিনিষ। কিন্তু এদেশে অঢেল অর্থবিত্ত, ক্ষমতা ও সুযোগের মানুষেরা এতদিনে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে এদেশে আনবার মত প্রযুক্তি ও পদ্ধতি যেটা পেয়েছেন, সেটা অকহতব্য ম্যাসেজ পার্লার। সেখানে চাপরাশী আর মন্ত্রী একাকার। সভ্যতা নয়, অসভ্যতার বিকাশে এদেশের নেতৃত্ব ও কদর্যতার কীটগুলো একত্র হচ্ছে কোথাও কোথাও ; বিশ্বসভ্যতাকে ধরে আনবার কাজ ফেলে তান্ডব চলছে অন্য মহলে।

মেধাবুদ্ধি তারিফ করা হলেও বাংলাদেশ-ভারতের দক্ষিণ এশীয় নেতৃত্বের ভাবনার দৌড় সীমিত। প্রবৃদ্ধি হার ৫ ভাগ করার জন্য ৭২ হতে ৯২ পর্যন্ত এরা জান দিচ্ছে, ওটাকে ১৫ ভাগ করার চিন্তা মগজে ধরে না। আমদানী রপ্তানীর ব্যবধান কমানোর জন্য জাতীয় আয়ের ১০ শতাংশে সমান ঋণকর্জ করার মানসিকতা এরা জাতিকে দান করেছেন কিন্তু আমদানী-রপ্তানীর বিস্ফোরণে দেশকে কর্মমুখর শিল্পসভ্যতার দেশে পরিণত করার কথা ভাবছেন না। এরা কমিশন পেলে আন্তর্জাতিক মহলের প্রযুক্তির বর্জগুলি কিনে এনে দেশ ভরে ফেলে, কিন্তু যুগান্তর সৃষ্টির মত প্রযুক্তির সন্ধানে 'পরশপাথর' সন্ধানী ক্ষ্যাপার মত নামে না। সপ্তদশ শতাব্দীর পর বৃটিশরা এদেশকে যেমন কৃষকের জাতে পরিণত করেছে, সেই অধঃপতিত মানসিক স্তরে আবদ্ধ থেকে শাসকেরা এদেশকে দোকানদার ও কমিশনভোগী জাতিতে পরিণত করেছে, কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর শিল্প পল্লী, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কমপিউটার সাধনার ভিত্তি এরা অর্জন করেনি, জাতির জন্য। জনপ্রিয় সরকার এদেশে মূর্খদের সরকার এবং টেকনোক্রেট সরকার এদেশে লুটেরা সরকারে রূপ নিচ্ছে। এ অন্ধ আবর্ত ও পুনরাবৃত্তি একটা জায়গায় থামিয়ে ঠেলা গাড়ী, খুটবৃত্তি মেক্যানিটিক যন্ত্র শিল্পের প্রস্তরযুগ থেকে প্রবল গতিতে জনগণকে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ উৎপাদনের পথে জীবনজয়ের দিকে এগিয়ে নিতে অক্ষমতাটাই হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির ও কমপিউটারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার কারণ।

ভারতের সম্বিত ফিরেছে গত বছর। আচার আর মৃৎপাত্র রপ্তানী আয়ের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার নেমে যায় তার এমন পর্যায়ে, যা দিয়ে পনের দিনের আমদানীও চলবে না। আর তখনি সরকারী প্রশাসন ল্যাজ ঝুলানো ঠ্যাঙ দোলানো আত্মশ্লাঘার অবস্থান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সংকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য। বাংলাদেশে আমদানী কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল খানিকটা পুষ্ট হওয়ায় বর্তমান সরকার তেমনি এক আত্মশ্লাঘায় ভুগছে। অর্থনীতিতে মন্দা কাটতে শুরু করলে কিংবা একটি ফসল হানি ঘটলে ভারতের মত প্রচণ্ড সংকট বাংলাদেশেও মাথা চাড়া দেবে। ভারতের সংকট অবশ্য ভারতের জন্য একটা আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক নেতা, পরিকল্পনাবিদ ও সংস্থাগুলি ফেলে রাখা কাজ এবং উদাসীনতায় উপেক্ষিত কার্যক্রমে হাত দিয়েছে। এখন আর সংস্কার বা পদক্ষেপকে দায়সারা ব্যাপার মনে হচ্ছে না তাদের। বাংলাদেশ প্রতি তিনবৎসর পরে একবার সংকটে পড়ে আর লুটেরা বদল করে। কিন্তু সংকট থেকে শিক্ষা নিয়ে চিরতরে তার সমাধানে অগ্রসর হয় না। কারণ এদেশে শাসকরা জনগণের ভাগ্যবদলের জন্য ক্ষমতায় আসে না, আসে নিজভাগ্য বদলের জন্য।

উল্লেখ করা দরকার, ৯০ সনে ভারতের রপ্তানী দারুনভাবে মার খেলেও সফটওয়্যা রপ্তানী ছিল রপ্তানী বৃদ্ধির হারের দিক দিয়ে শীর্ষে।

ভারতের বর্তমান সংস্কার আঞ্চলিক বিদ্রোহ ও সমরবাদী অভিপ্রায়ের চাপ এড়িয়ে অব্যাহত থাকলে এশিয়ায় মালয়েশিয়ার পর নূতন বাঘ হয়ে উঠতে পারে ভারত। দক্ষিন এশিয়ায় বাংলাদেশের মত দেশেও এমন রূপান্তর, সংস্কার, অগ্রগতি ও প্রযুক্তিবিপ্লবের সুযোগ আছে। কিন্তু বর্তমান সরকার আর পুরাতন প্রশাসনের কাছে এ সুযোগের কোন অর্থ আছে কিনা জানা নেই। বিশেষ করে কমপিউটার কাউন্সিল হয়ে উঠেছে 'ঘটাল রাজার বন' - একাদিক্রমে কোন্দলের জন্য এ প্রতিষ্ঠান সরকারী অর্থব্যয় করছে বছরের পর বছর, কোন ফলাফল না দিয়ে। আশ্চর্য, এ নিয়ে জাতীয় সংসদে একটা প্রশ্নও কেউ তুলছেননা। এ হচ্ছে দিয়ে জবাবদিহিতার প্রশাসন !

দক্ষিনপূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যে যে কর্মমুখর মানসিকতা ও কর্মবাদী জীবন সংস্কৃতির উন্মেষ : চীনা,

থাই, মালয়ীরা যে ধরণের পরিশ্রমী মানুষ, তার সমতুল্য নজীর বাংলাদেশে নেই। বাংলাদেশে মগজ আছে, টেলিযোগাযোগ ক্ষমতা আছে, কিন্তু সমষ্টিগত অবদান হচ্ছে, সরকারী-বেসরকারী উদ্যমকে ফতুর করে ব্যক্তিগত বাড়ীগাড়ী অর্জন। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের কথা বলা হয় পদে পদে। কিন্তু বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার হয় নানাদিকে। এ অর্থ ব্যয়ে বিদেশে আপন পণ্য বিপণন ও আধুনিক প্রযুক্তি আহরণের অফিস বসিয়ে দেশে উৎপাদন ও রপ্তানীর ক্ষেত্র সৃষ্টি করার প্রবৃত্তি নেই। যেসব প্রবীণ ব্যক্তিত্ব সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে সত্যিকার অবদান রাখার পক্ষপাতি, তাঁরা জানেন, পদে পদে বাগড়া দেবার জন্যই সরকারী দফতর থাকে। মধ্যপ্রাচ্যের ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দানের শর্তে ভারত মধ্যপ্রাচ্যের অর্থে কলেজ, ভার্সিটিতে কমপিউটার বসিয়েছে। বাংলাদেশে স্কুলে কমপিউটার যায়নি, কারণ কমপিউটার কাউন্সিল সে প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনের হাত থেকে নিয়ে আটকে রেখেছে আজ ৫ বৎসর। এমনি খন্ড খন্ড কতৃত্বের কাউন্সিল, কর্পোরেশন, ব্যুরো বাংলাদেশকে ১২শ ভুইয়ার দেশে পরিণত করে টোল আদায় করে খায়। এই কন্ট্রোলকালচার একটি প্রজন্মকে ধ্বংস করেছে, নূতন প্রজন্মের সামনেও সৃষ্টি করেছে বাধার বিন্ধ্যাচল।

ভারত এশীয় ব্যাঘ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, তা লক্ষ্য করা দরকার। তথ্য প্রযুক্তির শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমোদন প্রথা বাতিল হয়েছে ভারতে। বাংলাদেশ কাউন্সিলে বসে আছেন ইউনিক্স মহাশয়। কমপিউটার প্রয়োগ ও প্রবর্তনের প্রাথমিক পদক্ষেপ বাদ দিয়ে তারা ইউনিক্স ও ওরাকোল নিয়ে ব্যস্ত। তথ্য প্রযুক্তির শিল্প স্থাপনের জন্য অনেক নূতন সুবিধা প্রবর্তন করেছে। এ ধরনের শিল্পে বিদেশী প্রযুক্তি সহায়তা গ্রহণ করতে কোন ঝঞ্ঝাট নেই। ৫১ ভাগ ইকুইটি থাকলে বিদেশী বিনিয়োগ অনুমোদনেও কোন বাধা নেই। এক কোটি রূপী দিয়ে কেনা হলে বিদেশী প্রযুক্তি আয়ত্ব করার কার্যক্রমে অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। বিদেশী প্রযুক্তি কারিগর নিয়োজনে কোন সরকারী অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। মূলধন কলকব্জা আমদানীর ক্ষেত্রে কোন অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রহাতে ১৯৫৪ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত ২০ বৎসর যুদ্ধ করেছে ভিয়েতনাম। গত তিনবৎসর সেখানে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি ২০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগকারীরা তাদের চোখে হাল অবস্থা দেখে গিয়ে বলেন : ঘুষ দিতে হয় পদে পদে, এমন দেশে বিনিয়োগ করা হবে কেমন করে? চীন বরং যৌথ উদ্যোগের জন্য ভারতকে বেছে নিচ্ছে, বাংলাদেশকে ফেলে এটা আমাদের সরকার ও স্থায়ী প্রশাসনের অপার অবদান।

আমরা যখন হীনমন্যতা অদক্ষতা ও ঘুষ কালচারে নিমজ্জিত, তখন সমগ্র এশিয়ায় অন্য দৃশ্য।

গত বছর ১১ কোটি লোক অধ্যুষিত জাপানে প্রায় ২০ লক্ষ পিসি বসিয়েছেন ব্যবহারকারী নাগরিকেরা। এ সংখ্যাটি বিশাল ভারতের তুলনায় ৭ গুণ বেশী। বাংলাদেশ প্রায় জাপানের সমান জনসংখ্যার দেশ। এখানে কমপিউটারের সংখ্যা ৭ হতে ১০ হাজারের মধ্যে।

২৫ লক্ষ লোকের সিঙ্গাপুর ও ক্ষুদ্রদ্বীপ হংকং-এ কমপিউটার ব্যবহার করছেন ২ লাখ ৮০ হাজার মানুষ।

১০০ কোটি মানুষের ভারতের সমান কমপিউটার ব্যবহার করে এ দুই দ্বীপ ও অন্তরীপ দেশ। ভারতে প্রতি ৩৫০০ লোকের জন্য আছে একটি কমপিউটার। সিঙ্গাপুরে ১৮ জনের জন্য ১টি, কোরিয়ায় ৩৬ জনের জন্য ১টি। বাংলাদেশে ১১ হাজার হতে ১৪ হাজার লোকের জন্য একটি কমপিউটার এলেও তার বহুলাংশ প্রদর্শনী বস্তু কিংবা কেনার জন্য কেনা। তথ্য প্রযুক্তির নবযুগে কোন দেশ কতটা প্রবেশ করেছে, তা অনুমান করা যায় জনসংখ্যার সাথে কমপিউটারের সংখ্যা তুলনা করে। কমপিউটার বিজ্ঞানে ও চর্চায় অগ্রসর ভারতের অবস্থাই করুণ, বাংলাদেশের অবস্থাতো অকল্পনীয়। ভারতে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত সুধীজন জ্ঞান বিত্তে অগ্রসর মানুষের সংখ্যা যদি মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪ ভাগ হয়, তবে তাদেরই কমপিউটারের সম্ভাব্য ব্যবহারকারী হিসাবে বিবেচনা করা যায়। এদের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। এর মধ্যে শতকরা মাত্র ২ ভাগ কমপিউটার ব্যবহার করছেন। বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ২৬, বাংলা পড়তে ও লিখতে জানা জনসংখ্যা মাত্র ৮ শতাংশ। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সুধীজনের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৩/৪ শতাংশেরও কম। বাংলা ইংরাজীতে কমপিউটার ব্যবহার করতে পারবে এমন মানুষের সংখ্যা দাঁড়াবে ১ কোটির উপরে। এ হিসাবের মধ্যে আছে : সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত ১২ লাখ শিক্ষিত লোক + দেশে বিদ্যমান ৮০ লাখ শিক্ষিত বেকার + সরকারী বেসরকারী শিল্প ও পণ্যোৎপাদনে নিয়োজিত প্রায় ৩০ লাখ লোক। ১ কোটি ২০ লাখ সম্ভাব্য কমপিউটার ব্যবহারকারীর জন্য **বাংলাদেশে কমপিউটার ও পিসি মাত্র ১০ হাজার।**

বিশ্বে সবচাইতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে পিসি। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ১ কোটি ৪০ লক্ষ পিসি বসছে। ১২০০ কোটি ডলারের ৪০ লক্ষ পিসি এ অঞ্চলে বসেছে ১৯৯০ সালে। জাপান অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশের আগে যেমন উৎপাদন করতো কেবল রপ্তানীর জন্য, নিজের ব্যবহারে তা লাগাতো না, তেমনি অবস্থা এখন অতিক্রম করছে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের নব্যশিল্পায়িত দেশগুলি। তারা এখন নিজ দেশ, সমাজ ও প্রজন্মকে কমপিউটার সজ্জিত করে জীবনকে নিয়ে যাচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর কাতারে।

অর্থনৈতিক মন্দায় উন্নত ও অগ্রসর দেশে পিসি ও কমপিউটার কেনার ভাটা পড়েছে। এ অঞ্চলে জাপানের পর সর্ববৃহৎ পিসি ব্যবহারকারী অষ্ট্রেলিয়া। **বাংলাদেশ থেকে যারা অষ্ট্রেলিয়ায় বহির্গমনের অনুমতি পেয়েছে, তাদের মধ্যে কমিউনিটারবিদদের সংখ্যাই সর্বাধিক। ১৯৯০-এর মন্দায় অষ্ট্রেলিয়ায় পিসি ব্যবহারকারী ব্যাঙ্ক ও সরকারী অফিসগুলি কেনাকাটা কমিয়েছে। তবু অষ্ট্রেলিয়ায় পিসি বাড়ছে বৎসরে ১০ শতাংশ হারে।**

হংকং-এর অর্থনীতি মন্দাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তবু পিসির ব্যবহার বেড়েছে শতকরা ১০ ভাগ হারে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রবৃদ্ধি হার শতকরা ৮ ভাগ, কিন্তু কমপিউটারের ক্রয় ও সংগ্রহ বেড়েছে শতকরা ২০ ভাগ। অর্থ আছে ১১০ কোটি ডলার (৪ হাজার ৬ শ কোটি টাকা)। আগে দক্ষিণ কোরিয়ায় পিসির দাম ছিল খুব বেশী, প্রায় ভারত বাংলাদেশের সমান। বহুজাতিকের জন্য তাদের বাজার খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে দর অর্ধেক কমে যায়।

মালয়েশিয়ায় আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ছে শতকরা ৯ ভাগ হারে, কিন্তু পিসি ব্যবহার বাড়ছে শতকরা ২৫ ভাগ হারে। মালয়েশিয়ায় কমপিউটার তৈরী শুরু হয়েছে। সিঙ্গাপুরে পিসির বাজার বাড়ছে শতকরা ২০ ভাগ হারে, কোম্পানী ও গৃহস্থালী প্রয়োজনেই এর প্রসার। কোরিয়া আর সিঙ্গাপুরে ছাত্ররা কমপিউটার ব্যবহার করছে ব্যাপকভাবে। তাইওয়ানে প্রবৃদ্ধি হার শতকরা ৫ ভাগ, কিন্তু পার্সোনাল কমপিউটার ব্যবহার বাড়ছে ৮ শতাংশ হারে।

১৯৯০ সনে ভারতে যত কমপিউটার বাজারজাত হয়েছে, তার প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ বাজারজাত হয়েছে চীনে। কমপিউটার সহ সব প্রযুক্তির দেশীয়করণের চেষ্টায় ভারতের মত চীনও উদগ্রীব। তবে দুদেশই বহুজাতিকের সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রযুক্তি আয়ত্ব করছে।

এশিয়ায় কমপিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে থাইল্যাণ্ডের অগ্রগতি শুরু হয়েছে সবেমাত্র। কমপিউটারের জগতে থাইল্যাণ্ড প্রবেশ করেছে বাংলাদেশের পরে। দক্ষ কমপিউটার জনশক্তি তাদের বাংলাদেশের চাইতে কম। কিন্তু আজ থাইল্যাণ্ডও অর্থনীতির প্রসার ঘটছে বৎসরে ১০ ভাগ হারে, কিন্তু পিসির বাজার বাড়ছে ৩০ ভাগ ও হার্ড ওয়্যারের প্রসার ঘটছে ২৩ ভাগ হারে। সরকারী দফতর ছাড়াও ছোটখাটো দোকান বিপনি-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রথমবারের মত কমপিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। থাইল্যাণ্ডে কমপিউটারের উপর ট্যাক্স ৫%। বাংলাদেশে বাতিল প্রযুক্তি টাইপ রাইটের উপর ট্যাক্স ৫%। দেশ ও জাতিকে প্রযুক্তি বঞ্চিত রাখার কি সুচিন্তিত প্রয়াস!

	সিংগাপুর	তাইওয়ান	হংকং	কোরিয়া	চীন	ভারত	বাংলাদেশ
আয়তন, হাজার বর্গ কিঃমিঃ	০.৬	৩৬	১	৯৯	৯৫৬১	৩২৮৭	১৪৪
জনসংখ্যা, লক্ষ	২৭	২০২	৫৮	৪২৮	১১১৩০	৮৩৫০	১১০০
প্রধান আমদানী/রপ্তানী অংশীদার	আমেরিকা/ জাপান	আমেরিকা/ জাপান	আমেরিকা/ চীন	আমেরিকা/ জাপান	হংকং	রাশিয়া	আমেরিকা/ জাপান
জাতীয় আয়, কোটি ডলার	৩৫০০	১৬,০০০	৭,০০০	২৩,৭০০	৪১,৩০০	২৮,০০০	২,০০০
মাথাপিছু আয়, ডলারে	১১,২০০	৬,৩০০	১০,০০০	৪,৫০০	৩৬০	৩৪০	১৭০
মূল্য স্ফীতি	২%	৪%	৮%	৬%	৬.৫%	১০%	১০%
প্রতি পিসিতে লোকসংখ্যা	১৮	২০	৩০	৩৬	২,২৫০	৩,১৫০	১৫,০০০
স্থাপিত পিসির সংখ্যা, লক্ষ	১.৫	১০	২	১২	৫	৩	০.০৭
হার্ডওয়্যার বাজার, কোটি ডলার	৪০	৬৪	৪০	১২০	৫০	৭০	৫.৮০
প্রতি হাজার লোকের জন্য পিসির সংখ্যা	৫৫.৬	৫০	৩৩.৩	২৭.৮	০.৪৫	০.৩২	০.০৭

* ১৯৯০ সনের হিসাব অনুসারে

বাংলাদেশের স্থান এখানে কোথায়?

আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৪/৫ শতাংশে। জাতীয় প্রবৃদ্ধির চাইতে বেশী গতিতে পিসির প্রসার কি ঘটেছে বাংলাদেশে? ৮৫ হতে ৯০ পর্যন্ত ৭ হাজার কমপিউটার সংগ্রহ করেছে বাংলাদেশ।

কয়েক শতাব্দীর নিশ্চল অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশে ভারী শিল্পের চাইতে গার্মেন্টসের মত হালকা শিল্পের প্রসার বেশী। কমপিউটারও যুক্ত হয়েছে নবতর শিল্প-বাণিজ্যের সাথে। অথচ সংখ্যা ও বিনিয়োগের দিক দিয়ে তা খুবই সামান্য।

এশিয়া পিসির প্রসার ঘটছে বৎসরে ২০ ভাগ হারে। ইতিমধ্যে ১ কোটি ৬০ লাখ পীস পিসিতে এশিয়া পরিব্যাপ্ত। জাপানে পিসির প্রসার ঘটছে রঙীণ টেলিভিশনের সাথে পাল্লা দিয়ে। জাপানে প্রায় ১ কোটি লোক কমপিউটার ব্যবহার করতে শুরু করায় দেশটি সফটওয়্যারের অবিশ্বাস্য বাজার হয়ে উঠতে যাচ্ছে। ভারতের বিশেষজ্ঞরা জাপানের বিশাল পরিব্যাপ্ত পিসির রাজ্যের দিকে তাকিয়ে নিজেদের নগণ্য অবস্থা অনুমান করে বলছেন, পিসি ও কমপিউটার ভারতে এত সামান্য যে, এই বাজারের জন্য সফটওয়্যার তৈরী ও উদ্ভাবনাও কোন লাভজনক ব্যাপার নয়। ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের জন্য কমপিউটারকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা ও গৃহস্থালী ব্যবহারকারীরা পিসির চাহিদাকে বহুগুণ পল্লবিত করেছেন। কিন্তু ভারতসহ এসব দেশ কী সাধনা, একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা নিবেদন করে এ অগ্রগতি অর্জন করেছে, তা আমরা জানি। **জাপান এক বৎসরে যত পিসি নিয়েছে ব্যবহারে, ভারত একদশকেও তা ব্যবহারে আনতে পারেনি।**

ভারত যত পিসি ব্যবহার করছে, বাংলাদেশ করছে তার একশ ভাগের তিন ভাগ। বিশ্বে পিসি বিপ্লব শুরু হবার এক দশক পরে বাংলাদেশের অবস্থা কী করুণ, তা না বললেও চলে।

দক্ষিণ কোরিয়া ঃ কৃষক দেশে সমৃদ্ধি

কমপিউটারের রাজ্যে দক্ষিণ কোরিয়া প্রবেশ করেছে ১৯৮০-র দশকের শেষ ভাগে। কোরিয়া উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে গঠিত দক্ষিণ কোরিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে মার্কিন দখলে চলে যায়। ১৯৪৮-এ স্বাধীনতা লাভের পর কোরিয়া যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মার্কিন সেনা উপস্থিতি লাভ করে দেশটি। বৎসরে শতকরা ৮ ভাগ হারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এদেশটিতে তথ্য প্রযুক্তির বাজার বেড়ে উঠেছে। জাপান ও অষ্ট্রেলিয়ার পরেই এ অঞ্চলে জোরালো বাজার কোরিয়ার। বৎসরে ৫ লক্ষ পার্সোনাল কমপিউটার বিক্রি হয় দেশটিতে। কয়েক বৎসর আগেও ভারতের মত ছিল দক্ষিণ কোরিয়া। বিদেশী কমপিউটার নিজ বাজারে প্রবেশের সুযোগ না দিয়ে সে চেষ্টা করেছিল নিজ পণ্যে বাজার ভরতে। **কিন্তু আমদানী উদার করার পর বহুজাতিক সংস্থা বন্যার স্রোতের মত কমপিউটার বইয়ে দেয় দক্ষিণ কোরিয়ায়। তীব্র প্রতিযোগিতায় এর দাম কমে আসে।**

একদা দরিদ্র কৃষকের দেশ ছিল দক্ষিণ কোরিয়া। **ফসল ওঠার আগে কার্তিকের আকালের মত অনটনের দিনে ১৯৬২ সনেও দক্ষিণ কোরিয়ার মানুষ গাছের বাকল চিবাতো।** আজ তথ্য প্রযুক্তি, বস্ত্র শিল্প, ইস্পাত, ইলেকট্রনিক্স, পেট্রো ক্যামিকেলস, মোটরগাড়ী, সিমেন্ট, জাহাজ নির্মাণ হয়ে ওঠেছে প্রধান শিল্প। ১৯৯০ সনে দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানী দাঁড়ায় ৮০০০ কোটি ডলার, এটা জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৩০ ভাগ। বাংলাদেশের রপ্তানী ২০০ কোটি ডলার, এটা জাতীয় আয়ের ৭/৮ শতাংশ।

শ্রমিক অসন্তোষ, মূল্যস্ফীতি, মুদ্রার অবমূল্যায়ন, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, সরকারের প্রতি অনাস্থা, শেয়ারের মূল্য হ্রাস ইত্যাদি কারণে দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় উৎপাদন কমলেও দেশটির জনগণ স্থায়ী স্বাচ্ছন্দ্যের অনেক উপরে থাকবে।

কোরিয়ার পিসি বিক্রেতাদের মধ্যে যার দাম কম,

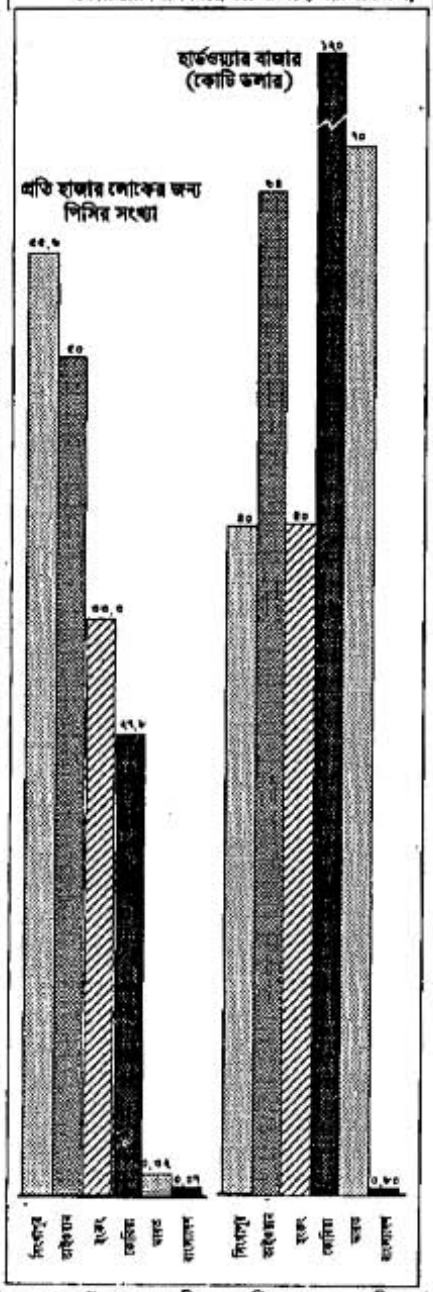

তার পণ্যই সেখানে বেশী চলে। শিক্ষাখাত, গৃহস্থালী ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে এদেশে কমপিউটারের বড় খদ্দের। দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার হার্ডওয়্যার তৈরী ও রপ্তানীকে খুব বেশী উৎসাহ যোগায়। দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বাজার সৃষ্টিতেও সরকার বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় ঠিক হংকং এর মত ঘোরতর না হলেও তথ্যপ্রযুক্তির পেশাজীবির অভাব রয়ে গেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় মাতৃভাষায় কমপিউটার চর্চার সুযোগ খুব কম থাকায়, তার বাজার খুব বেশি বাড়ছে না। বাংলাদেশে ডেস্কটপ পদ্ধতিতে দেশীয় ভাষা ব্যবহার করায় মুদ্রণ শিল্পে কমপিউটার ব্যবহারের প্রসার ঘটেছে। মুদ্রণ বহির্ভূত এলাকাতেও কমপিউটারে বাংলা প্রবর্তনের চেষ্টা চলছে।

এর ফলে বাংলাদেশে কমপিউটার ব্যবহার ও চর্চার প্রেক্ষিতটা হয়ে উঠছে বিরাট। কিন্তু সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না।

হংকং ঃ প্রযুক্তির পোড়োবাড়ী।

চীনের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে ক্যান্টন নদীর মুখে হংকং হচ্ছে ক্ষুদ্র ২৪০টি চরদ্বীপের পুঞ্জ। ১৮৪৩ হতে এ দ্বীপ বৃটিশ উপনিবেশ হিসাবে বহাল আছে। ১৯৮৭ সনে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় চীন ১৯৯৭ সনে হংকং ফিরে পাবে। তার আগেই মূল চীন হয়ে উঠার চেষ্টা করছে হংকং-এর মত। ১৯৮৯ সনের ৪ঠা জুন পিকিং -এর তিয়েন আনমেন ময়দানে গণতন্ত্রের দাবীতে সমবেত ছাত্রদের উপর প্রবীণ চীনা নেতাদের সামরিক দলন অভিযানের পর চীনের সাথে হংকং-এর একজাতি দুই সামাজিক ব্যবস্থার আঙ্গিকে ঘর করার স্বপ্ন ভেঙ্গে পড়েছে। চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে ব্যবসা করে, এমন অনেক বহুজাতিক সংস্থার সদর দফতর হংকং-এ অবস্থিত। তিয়েন আনমেন ঘটনায় আস্থা ভেঙে পড়লেও এসব বহুজাতিক চীনের বিশাল বাজার এবং হংকং -এর খোলামেলা নীতির কারণে এখনও সেখানে পড়ে আছে। চীনের ঘটনার পর হংকং এর বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি হার ৭ হতে ২-এ নেমে গেছে।

তথ্য প্রযুক্তি, টেলিযোগাযোগ আর অর্থলগ্নি কারবার থেকে হংকং-এর ৭০ ভাগ আভ্যন্তরীণ আয় আসে। জাপানের বাইরে এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান স্বার্থ কেন্দ্র হচ্ছে হংকং। এখানে মার্কিন বিনিয়োগের পরিমাণ ৭০০ কোটি ডলার। ৫৮ লক্ষ লোকের দ্বীপ হংকং। ১৯৮০ সনে হংকং-এর রপ্তানী ছিল ৯০০০ কোটি ডলার। রপ্তানী আয় তখন বৎসরে ২০ ভাগ হারে বাড়ছিল। এর শতকরা ৫০ ভাগ রপ্তানীই ছিল পুনঃ রপ্তানী; অন্যদেশে মাল তৈরী করে এনে হংকং থেকে তৃতীয় দেশে রপ্তানী। পুনঃরপ্তানীর ২৫ ভাগ যেত চীনে। বাকীটা অন্যান্য দেশে। সুতীবস্ত্র, প্লাস্টিক, ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম, টেলিযোগাযোগ, কমপিউটার সামগ্রী এদেশের প্রধান রপ্তানী। বাংলাদেশের গার্মেন্টস তাদের কাঁচামাল বহুলাংশে এদেশ থেকে আনে। আবার এদেশের ব্যাপারীরাই (বায়ার) বাংলাদেশে তৈরী পোষাক কিনে অন্য দেশে পাঠিয়ে বিপুল অর্থ রোজগার করে। নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কার জন্য বাংলাদেশ এ ধরণের পুনঃ রপ্তানীর কারবার শুরু করতে পারে বলে মীর্জা হাফিজসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন।

হংকং-এ তথ্যপ্রযুক্তির লোকবল খুব কম। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তিতে যারা কাজ করছে ১৯৯৭ সনের আগেই হংকং ছেড়ে অন্যদেশে চলে যাবে। লোকের স্বল্পতায় সেখানে এখন তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের মাইনে বাড়ছে। লোকের অভাবে অপরিপক্ক নবীনরা খুব উচ্চপদে চলে যাচ্ছে। **হংকং ব্যক্তি মালিকানা ও সরকারের অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত অর্থনীতির দেশ হলেও ১৯৯০ সনে হংকং সরকার অকস্মাৎ বিপুল পরিমাণ তথ্য প্রযুক্তি ক্রয় করে এ শিল্পকে চাঙ্গা করে। ১৯৯৭ সনের মধ্যে অনেক মেধা ও প্রতিষ্ঠান হংকং ত্যাগ করে কানাডা ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে সরে যাবে। তার আগেই হংকং ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে প্রযুক্তি পোড়াবাড়ী। এখান থেকে অতীব মূল্যবান প্রযুক্তি সন্ধান ও সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে নেমেছে ভারত। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার, আমলা, কর্তা ও সংস্থার কোন গরজ ও খবর নেই।**

সিংগাপুর ঃ সকল খাতে তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের দেশ

বিন্দুর মত ক্ষুদ্র এদেশটি প্রযুক্তিগত ও আর্থিক ভিত্তি নির্মাণ করে কমপিউটার প্রযুক্তির হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, এখন সমগ্র এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল তার তথ্য প্রযুক্তির বাজার। ২৭ লক্ষ মানুষের এ দেশটির আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৩৫০০ কোটি ডলারে পৌঁছে (বাংলাদেশঃ ১১ কোটি মানুষ ঃ ২০০০ কোটি ডলার আয়) ১৯৯০ সনে। প্রতি বৎসর দেশটিতে হার্ডওয়্যারের বাজার বাড়ছে ২০ শতাংশ হারে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এদেশের সাফল্যের ভিত। পিপলস এ্যাকশন পার্টি, বলতে কি, প্রায় একরোখাভাবে, এদেশ শাসন করছে ১৯৫৯ সন থেকে। এশিয়ার মধ্যে মাথা পিছু আয় এদেশেই সবচাইতে বেশী। প্রতি ২ জন লোকের একটি টেলিফোন আছে। প্রতি ৫ জনের আছে একটি টিভিসেট। শিক্ষিতের হার ৮৭। এখানে বিদেশী বিনিয়োগের কোন সীমা পরিসীমা নেই। ১৯৯০ সনে সিঙ্গাপুরের রপ্তানী ৫০০০ কোটি ডলার (বাংলাদেশ ২০০ কোটি ডলার) ছাড়িয়ে যায়। পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রী, ইলেকট্রনিক্স, রাসায়নিক, খাদ্য হচ্ছে এদেশের রপ্তানী, অথচ দেশটি পুরোটাই এক শহর। সবকিছু আমদানী করে, তাতে মূল্য সংযোজন করে, পুনঃ রপ্তানীর দক্ষতায় সিঙ্গাপুর জাহাজ নির্মাণেও অর্জন করেছিল সাফল্য। যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, ইউরোপ ও বাংলাদেশ এর রপ্তানী বাজার। এ অঞ্চলের বাণিজ্য ও পরিসেবা কেন্দ্র হিসাবে সিঙ্গাপুর গড়ে উঠেছে। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে ত্রিভুজ রচনা করে সিঙ্গাপুর পরবর্তী বিকাশের জন্য তৈরী হচ্ছে। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি সিঙ্গাপুরকে তাদের সদর দফতর করার জন্য এগিয়ে আসছে, আরও বেশী সংখ্যায়। এখানে সুবিধার মধ্যে আছে ঃ অবাধ বাণিজ্য, বহুজাতিকের বিনিয়োগের জন্য কর মওকুফ (বাংলাদেশে বহুজাতিক বিতাড়নের জন্য আছে পাশ্চাত্য সমাজতান্ত্রিদের সাহায্যপুষ্ট নানা কেন্দ্র), খুব কম ভাড়ায় ভবনাদি পাবার সুবিধা, নিম্ন হারের মূল্যস্ফীতি, নির্ঝঞ্ঝাট টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রশিক্ষিত, কর্মানুরাগী শ্রমশক্তি। ১৯৮৯ সনে সিঙ্গাপুর সরকার সিঙ্গাপুরকে উচ্চ দক্ষতা, উচ্চ মূল্য সংযোজন, প্রযুক্তি নিবিড় তথ্য প্রযুক্তির ঘাঁটি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য জাতীয় তথ্য প্রযুক্তি পরিকল্পনা তৈরী করে। সকল খাতে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য গৃহীত হয় এ পদক্ষেপ। এমনিতেই সিঙ্গাপুরের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্বে সর্বোন্নতদের কাতারে। এর সাথে তথ্য প্রযুক্তির সংযোগটা সোনায় সোহাগা। সিঙ্গাপুর ISDN ব্যবস্থা প্রয়োগের অগ্রপথিক। ভিডিও টেক্সট সিষ্টেম, টেলিভিউ ব্যবস্থায় সিঙ্গাপুর এশিয়ায় সবার চাইতে এগিয়ে। ইলেকট্রনিক ডাটা ইন্টারচেঞ্জ (ইডিআই), ট্রেডনেট, ইত্যাদি ব্যবস্থা সিঙ্গাপুরকে করে তুলছে, বাণিজ্যিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। ২০টিরও বেশী সরকারের মধ্যে তথ্য ও দলিল এক নিমিষে বিনিময় করতে পারে ইডিআই। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে কোম্পানীগুলি আমদানী রপ্তানীর দলিল বিনিময় করতে পারে ইলেকট্রনিক পন্থায়। চোখের পলকে বন্দরসহ নানা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এসব দলিলের ভিত্তিতে অনুমতি গ্রহণ করে ইডিআই ও তারপর আছে বিশ্বজোড়া যোগাযোগে রাস্তা। যেমন, ৫০টি দেশের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য উদ্যুক্ত দুটো উপগ্রহ ভূকেন্দ্র। বিমান থেকে টেলিফোনে ও ইলেকট্রনিক পন্থায় ভূপৃষ্ঠের সাথে কথা বলা ও তথ্য বিনিময় করার জন্য বিশ্বের প্রথম ব্যবস্থা। ইনটেলসেট বিজনেস সার্ভিস নামে একটি সার্বক্ষনিক তথ্য নেটওয়ার্ক, ১ লক্ষ ৩০ হাজার ফ্যাক্স। আসিয়ান দেশসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে পাতা ফাইবার অপটিক ক্যাবলের নির্মিয়মান ব্যবস্থা। সিঙ্গাপুরের তথ্য প্রযুক্তি শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। ৫০টির মত কোম্পানী ৩৫ হাজার কর্মচারী নিয়ে বৎসরে ৫০০ কোটি ডলারের হার্ডওয়্যার নির্মাণ করছে। সিঙ্গাপুর ৪০ লক্ষ ডলারের হার্ডওয়্যার আমদানী ও ৪০০ কোটি ডলারের হার্ডওয়্যার রপ্তানী করে। ১০০ কোটি ডলারের তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে নিয়োজিত ৩৫০টি কোম্পানীর কর্মচারী সংখ্যা ৫ হাজারের উপরে।

কেবলমাত্র ১৯৯০ সনে প্রায় ৩৬ হাজার পিসি বিক্রি হয়েছিল সিঙ্গাপুরের আভ্যন্তরীণ বাজারে এটা সমগ্র বাংলাদেশে এযাবৎকালে বিক্রি করা সমুদয় পিসির ৫ গুণ।

সিঙ্গাপুরের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প থেকে মেধা নিঃসরণ সমস্যা খানিকটা দূর করা হয়েছে। সিঙ্গাপুর সরকার বিদেশী ছাত্রদের শিক্ষাপ্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ করার অনুমতি দিচ্ছে। বুয়েটে অধ্যয়নরত কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্রদের পাশ করার পর পর চাকরির অগ্রিম অফার দিয়ে রেখেছে সিঙ্গাপুর কয়েকটি কোম্পানী বিদেশে অধ্যয়নরত সিঙ্গাপুরের ছাত্রদের চাকুরি দিয়ে দেশে আনারও চেষ্টা চলছে। সরকার বিয়েতে, সন্তান লাভে উৎসাহ দিচ্ছে নাগরিকদের। তিন বা ততোধিক সন্তানের জনক জননীকে দেওয়া হচ্ছে পুরস্কার।

ক প্পি উ টা রে লো টা স ১-২-৩

বাংলা ভাষায় কম্পিউটার বই—এর জগতে নতুন সংযোজন

কম্পিউটারে লোটাস ১-২-৩

যারা কম্পিউটারে "লোটাস ১—২—৩ প্রোগ্রাম শিখেছেন, শিখছেন বা শিখবেন"—তাদের জন্য।

পাবেন—

- ☐ অনুপম জ্ঞান ভান্ডার, ১৫৬ ঢাকা ষ্টেডিয়াম (দোতলা), ঢাকা।
- ☐ আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৮০/১৮১ ঢাকা নিউমার্কেট, ঢাকা।
- ☐ ষ্টারট্রেক কম্পিউটার্স, ৫৩/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (দোতলা), ঢাকা।

এছাড়াও অন্যান্য অভিজাত বই বিপণীতে।

লো টা স ১ ২ ৩

লো টা স ১ ২ ৩

ক প্পি উ টা রে লো টা স ১-২-৩

তাইওয়ান ঃ 'জাপানীমাল' থেকে উন্নত বিজ্ঞানের রাজ্যে

১৯৪৫ সনে মাওসেতুং-এর গণমুক্তিফৌজ চিয়াং কাইশেকের কুওমিংটাং সরকারকে মূল ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করলে ফরমোজা দ্বীপে এসে বিদেশী শক্তির আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় চিয়াংকাইশেক। এ দ্বীপটিই আজ শিল্পসমৃদ্ধ তাইওয়ান। মূলচীন যখন উন্নয়নশীল দেশ তখন ২ কোটি মানুষের তাইওয়ান হয়েছে এশিয়ার বাঘ। তাইওয়ানের মাথাপিছু আয় ৪০০০ ডলার (বাংলাদেশ ১৭৫ ডলার)। এ আয়ের বহুলাংশ (৫৫%) আসে সার্ভিস খাত থেকে। ৩৫% আসে পণ্যোৎপাদন থেকে। গত ৮ বৎসরের মধ্যে সবচাইতে শোচনীয় বৎসর তার গেছে ১৯৯০ সনে।

এ মন্দার মধ্যেও তাইয়ানে হার্ডওয়্যারের প্রসার ঘটেছে ১০ ভাগ হারে। তাইওয়ানে বিদেশী বিনিয়োগ ঈষৎ কমছে। ৮৯ সনেও সেখানে রসায়ন, ধাতব শিল্প, ইলেকট্রনিক্সে ২৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হয়।

মন্দার ফলে পিসি উৎপাদকেরা দারুণ মার খায়। তবু ১০ লক্ষ পিসি রপ্তানী হয়েছে। ৩ লক্ষাধিক পিসি দেশেই বিক্রি হয়েছে। ১৯৯০ সনে সরকারী তহবিলের পৃষ্ঠপোষকতায় তাইওয়ানে বড় কমপিউটারের বিক্রি বেড়েছে ১২ শতাংশ।

বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে কমপিউটার সামগ্রী উৎপাদন করছে। সহনীয় দামে অপরিমেয় শিল্পপণ্যের বন্যা বইয়ে দিতে তাইওয়ানের জুড়ি নেই। বিশ্বজোড়া মন্দা ও পাশ্চাত্যের শুল্ক পাঁচিলের চাপে তাইওয়ানের রপ্তানীভিত্তিক শিল্প সমস্যার মধ্যেই আছে। কোরিয়ার সাথে সস্তা শিল্পপণ্যের প্রতিযোগিতায় তাইওয়ান কুলিয়ে উঠছে কম। তবু বহুজাতিক সংস্থা তাইওয়ানে বিনিয়োগ করছে। তাইয়ানে বিনিয়োগের ২৭ ভাগ জাপানী, ২২ ভাগ ইউরোপীয় ও ১৪ ভাগ মার্কিন। উচ্চতর প্রযুক্তি আকর্ষণের জন্য তাইওয়ান স্থাপন করছে নয়া শিল্পাঞ্চল। ভারী শিল্প এলাকা, বিজ্ঞান শিল্প পার্ক, সফটওয়্যার পার্ক নামে তিনটি শিল্পাঞ্চল গড়ছে তারা।

এরপর কোম্পানীর শেয়ার থেকে ফটকাবাজারির ঝোঁক সরে যাচ্ছে ভূমির দিকে। তাইপেতে জমির দামের কোন সীমা সরহদ নেই। এদিকে তাইওয়ানী কোম্পানীগুলি বিদেশে ১০০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। বিশ্বের বৃহত্তম নগদ ভাণ্ডার ৭৫০০ কোটি ডলারের পুঁজি তাইওয়ানের হাতে। আইবিএম, এইচপি, এনইসি, এনসিআর, ডিইসি, ওয়্যাং হচ্ছে কমপিউটারের ক্ষেত্রে তাইওয়ানে প্রধান নাম।

আদিম জীবনের গুহার অন্ধকার থেকে জনগণ চায় মুক্তি। জনগণ চায় আলো।

বহুমুখী অনিশ্চয়তা, সমস্যা, চাপ ও সংকটের মধ্যেও এশিয়ার সামান্য সম্পদের দেশগুলি তাদের জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে উন্নতি লাভ করতে গিয়ে কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তিকে করে তুলেছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের অগ্রগতির বাহন। বাংলাদেশে সমস্যা ও সংকট আসলে ততটা নয়, যতটা শাসকেরা প্রচার করে। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে তারা সদা সচেষ্ট। তারা বাংলাদেশে অপরিমেয় সুযোগ ও সম্ভাবনাকে হাতছাড়া করেছে অতীতে। করছে এখনও।

পঞ্চাশের দশকে কোরিয়ান যুদ্ধে পাটের অর্থ পেয়েও বাংলাদেশ উন্নতি লাভ করতে পারেনি। ষাটের দশকের অগ্রগতিকে রাজনৈতিক কারণে ধারণ করা যায়নি। ৭০-এর দশকের রাজনৈতিক সংঘাত, ৮০-র দশকের অবকাঠামো গড়ার দুর্নীতির মধ্যে কৃষি ও শিল্পের অবস্থা শোচনীয়। ৯০-এর দশকে গার্মেন্টস শিল্প ছাড়া সরকার ও দেশের হাতে কোন সহায় সম্বল নেই। এদেশের পৌনে ২ কোটি মানুষ বেকার। প্রতি বৎসর ২৫ লাখ মানুষ বাড়ছে। ১১ কোটি মানুষের চাহিদা ও কর্মশক্তিকে ব্যবহার করে অগ্রগতির জন্য তথ্যপ্রযুক্তিটাও হতে পারে প্রশাসন, শিল্প, ব্যবস্থাপনার অমোঘ হাতিয়ার। গ্রাম হতে কেন্দ্র, রাজধানী হতে সারা বিশ্বকে যুক্ত করে একটা অবহিত, তথ্যভিজ্ঞ, সচেতন জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য হাতিয়ার হচ্ছে কমপিউটার।

এ হাতিয়ারটিও সরকার ও প্রশাসন ব্যবহার করার ব্যাপারে মনোযোগী নয়। তথ্যপ্রযুক্তি ও কমপিউটার সমৃদ্ধ একবিংশ শতাব্দীর জীবন বিন্যাসের উন্মেষ ঘটেছে এশিয়ায়। এ খাতকে অগ্রাধিকারের দিয়ে সরকার একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে এদেশের অগ্রসর মেধা, বুদ্ধি, বিবেক ও সম্পদকে কাজে লাগাতে শুরু করলে তাইওয়ান ও হংকং এর মত দেশ থেকেও পাওয়া যাবে অপরিমেয় প্রযুক্তিগত সহায়তা। কিন্তু এক্ষেত্রে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মতই নেতৃত্ব নিতে হবে রাজনৈতিক, শাসক, সরকারকে।

এশিয়া জুড়ে ৯০-এর দশকের অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধির যাদু নিহিত আছে কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির রাজ্যে। পল্লী উন্নয়ন, বাজার সমীক্ষা, দেশ শাসন, অপরাধবৃত্তি দমন, রোগ চিকিৎসা, তথ্য এন্ট্রি, তথ্য বিশ্লেষণ, শিক্ষা, গবেষণা, কৃষি উন্নয়ন, শিল্প প্রযুক্তি কমপিউটারের সহায়তায় নবতর বিন্যাস লাভ করবে। সমগ্র এশিয়া অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে হয়ে উঠবে আসিয়ানের মত নিবিড় বন্ধনের মহাদেশ।

বাংলাদেশের স্থান তাতে কোথায় থাকবে, সে জিজ্ঞাসা জনগণের। সরকার, সংসদ সদস্য, শিল্পপতি, প্রযুক্তিবিদ ও দায়িত্বন্যাস্ত সংস্থার কর্তারা এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কতনা বাহানায় অতিবাহিত করছে দিন, মাস, বৎসর। এভাবেই অতিবাহিত হয়েছে পরাধীনতার যুগ। সেই পরাধীনতার আমলের মানসিকতা নিয়ে শাসক, প্রশাসক ও ভাগ্যবানেরা দেশকে ধরে রেখেছে দক্ষিণ এশিয়ার আদিম জীবনের গুহার অন্ধকারে। কিন্তু জনগণ চায় মুক্তি। জনগণ চায় আলো। ✦

১১ই জানুয়ারী '৯২ থেকে কোর্স শুরু

'সি' এবং প্যাসকেল

কমপিউটারলাইন ১৪৬/১, আজিমপুর রোড (চায়না বিল্ডিং গলি), ঢাকা। ফোন ৫০৬৪৮৫।

উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যেতে চান ?

TOEFL,কম্পিউটার,ইলেকট্রনিক্স এর উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভর্তিসহ I-20 ও ভিসার ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হয়।

আই, টি, এ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

১৮০/১ সিদ্দিক বাজার (২য় তলা) নর্থ সাউথ রোড ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ২৮২৪৪০
(গুলিস্তান বি, আর, টি, সি, বাসষ্ট্যান্ডের দক্ষিণে, ক্যাফে কুইন হোটেলের উপরে)